দীর্ঘ রাতের কুয়াশা ও রাষ্ট্রীয় মায়াফাঁদ

অতনু সিংহ

এখনও সেভাবে জাঁকিয়ে নামেনি শীত। এই লেখাটা লিখতে শুরু করেছিলাম যখন ৭ ডিসেম্বর (২০২০), তখনও সেভাবে শীতের দেখা নাই বঙ্গদেশে। যদিও ভোরের দিকে কুয়াশায় দৃষ্টি আবছা হয়ে থাকে, ব্যালকনির ওপাশে পড়শির বসতবাড়িও দৃশ্যমান হয় না সেভাবে। বঙ্গের হেমন্ত আয়োজনের মধ্য দিয়েই কুয়াশা প্রসারিত হতে থাকে চরাচরে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে ইংরিজি বৎসরান্তর ও গ্রেগরীয় দিনপঞ্জির নববর্ষের সূচনার দিনগুলোতে কুয়াশামুখর থাকে বঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তর, মফঃস্বল ও অরণ্য-মালভূমের অঞ্চলগুলি। আর হিমালয় পার্বত্যভূমের কথা তো বাদই দিলাম, সেখানে তো চিরশৈত্য (কিন্তু সেই চিরশীতও মোটেই পশ্চিমা শৈত্যপ্রদেশগুলোর মতো শীতকালীন বিষণ্ণতায় ধূসর নয়)। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল বাদে বৃহৎ বঙ্গদেশের গড় আবহাওয়ার কথা যদি ধরি তাহলে মোটামুটিভাবে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কথাই সকলের মাথায় আসবে। আমাদের বঙ্গযাপনে শীত বিষণ্ণ নয় বরং তা রঙিন। এখানে শীতের দীর্ঘ রাত ও কুয়াশার মায়াবী পর্দার ভিতরে শীত জ্বলে ওঠে কবিতার ক্যাম্ফায়ারে। ক্রমে শীত এলো।

১১ ডিসেম্বর সকাল থেকে শীত অনুভব করলাম। কিন্তু মেঘলা দিন। মামার বাড়ি থেকে ব্যাটারি চালিত রিক্সা (টোটো) করে নিজের বাড়িতে ফিরছি, টোটোচালক বললেন, রোদ উঠলে ঠাণ্ডা নামবে জাঁকিয়ে। কিন্তু এই ২০২০ বিষণ্ণ। কোভিড, বহু প্রিয়জনের মৃত্যু, লকডাউনের কারণে চারপাশ থেকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিষণ্ণ কেটেছে এই বছরটা প্রায় সকলেরই। এই বিষণ্ণতা যখন মড়ক বা অতিমারীকে ছাপিয়েও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত সূত্রে তৈরি হয় তখন তা বিমর্ষতার আকার নেয়। এইসব নিয়েই দুটি ছবিকে কেন্দ্র করে এই লেখাটা লিখব বলে ঠিক ছিল। এর মধ্যে একটি ছবি ফরাসী চলচ্চিত্রী আলা রেনের প্রামাণ্যচিত্র আলা রেনের 'নাইট এন্ড ফগ' এবং অপরটি কিম-কি-দুকের কাহিনীচিত্র 'দি নেট'। সেই মতো লেখা শেষ করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কৌরব অনলাইনের সম্পাদক প্রিয় আর্যনীল মুখোপাধ্যায়ের ইমেইলে। কিন্তু ১১ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় খবর পেলাম কোভিড পজিটিভে আক্রান্ত হয়ে কিম আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আবারো স্থবির হলাম, বিষণ্ণতা ও বিমর্ষতার ভিতরে নিজের অজান্তেই চালান হয়ে গেলাম। 'স্প্রিং, সামার, ফল, উইন্টার…এন্ড স্প্রিং', 'রাফকাট', 'রাফ প্লে', 'ড্রিম', 'বিউটিফুল' ও 'দি নেট'-এর মতো তাঁর যেকটি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে বসে দেখেছি, সেসব দেখার স্মৃতি আর তাঁর সিনেমার মায়া, ফ্যান্টাসি এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রকট অধুনান্তিক রাজনৈতিকতার ঘোর আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কী বা করার আছে!

নিশ্চিন্ত ঘুমের দেশে ভালো থাকেন কিম-কি-দুক।

চলচ্চিত্রীর শূন্যতার ভিতর কুয়াশাকাতর বিষণ্ণ শীতের রাতে এই সিনে-আলাপের সামান্য পরিবর্তন অবধারিত হয়ে উঠলো! লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও আকস্মিক প্রয়োজনীয় হয়ে এডিটের প্যারাগ্রাফে ঢুকে পড়লো কিমের মৃত্যু প্রসঙ্গ!

কিম-কি-দুক

এর আগে শীতের প্রসঙ্গ সূচনা করেছিল এ লেখার। যদিও এই গদ্য শীত বিষয়ক নয়।

শীত ও কুয়াশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ লেখার শুরুয়াত, কারণ কয়েকটি সিনে-অভিজ্ঞতার মধ্যে বারবার উঁকি মারছে বঙ্গীয় তথা উপমহাদেশীয় রাজনৈতিকতার ঘটমানতা। এবং এই রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা ব্যক্তিগত ও সমষ্টির যাপিতজীবন থেকে শিল্পে-নন্দনে উঠে আসছে বারবার, বারবার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে অস্তিত্বকে। যেখানে শীতকালের কালারফুল কার্নিভালিস্ট ইমেজ ও ইম্প্রেশনের বদলে মূর্ত হচ্ছে স্থবির, বিমর্ষ, বিষণ্ণ শীতের দীর্ঘ কুয়াশাকাতর ছবি! মনে হচ্ছে অদ্ভুত এক শৈত্যপ্রবাহে আমরা যেন রাষ্ট্রনৈতিক এক ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়ছি ক্রমশই।

সিনেমার দর্শক ও ছাত্র হিসাবে, কবি হিসাবে ও ব্যক্তি মানুষ হিসাবে সেসবের কথা না বলে পারা যায় না। বলতে গিয়ে সেই অনুপাতে তৈরি হয় মেটাফর, ইমেজ, বাক্য, দৃশ্য-শ্রাব্য এবং রেফারেন্স। এই রেফারেন্সে চলমান দৃশ্যশব্দমালার অভিমুখে ইতিহাস হতে ভেসে ভেসে সামনে দৃশ্যমান হয় সিনেমা। যেভাবে পারিপার্শ্বের পোস্টমর্টেমে মনোজগতে বাঙ্ময় হয় কবিতারা, তেমনই ভাইস-ভার্সায় সিনেমার ব্যক্তিগত পাঠের মধ্যে উঁকি দেয় যাপিতজীবনের রণরক্তপ্রেক্ষিত, যা চিত্রবহুলও বটে। তবে তা ধূসর এক শীতকালের সঙ্গে তুলনীয় বলেই মনে হয়। যে ইমেজ রাষ্ট্রের তৈরি করা।

আমি নিজেকে বড় বাংলার মানুষ হিসাবে দেখি। যদিও রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের দিক থেকে আমি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং পরিবার, জন্ম, শিক্ষা ইত্যাদি দিক থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে, চেতনাগত দিক থেকে আমি বড় বাংলা বা বৃহৎ বঙ্গের মানুষ। যে বৃহৎ বঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে পূবদিকে বিস্তৃত। যে বৃহৎ বঙ্গদেশের ধারণা সুলতান যুগের… ঘটমান বাস্তবতার কালচেতনায় এবং বৃহৎ বঙ্গের স্থানচেতনার মধ্যে দুটি সিনেমার ব্যক্তিজীবনের রাজনৈতিকপাঠের নিরীখে এই এই গদ্যের আয়োজন একত্রে দুইটি পর্বের। প্রথমে আমার রাষ্ট্রনৈতিকতার ভিতর থেকে আলা রেনের 'নাইট এন্ড ফগ'-এর সিনে-পর্যবেক্ষণ। এবং তারপর রাষ্ট্রের অন্দর থেকে প্রসারিত হয়ে ক্রমশই সীমানা অতিক্রমের আলাপ এগোবে নিজের যাপিতজীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার ভিতর

থেকে এবং তা কিম-কি-দুকের ‘দি নেট’ ছবিটিকে ঘিরে। এভাবে সিনে-কথনের রাজনৈতিক অভিযাত্রা জারি থাকবে বলে আশা করি।

প্রথম পর্ব

কুয়াশাচ্ছন্ন দীর্ঘতর বিমর্ষ রাত্রির কথকতা

ক্রমশই কুয়াশাচ্ছন্ন দীর্ঘ এক রাত যেন নেমে আসছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বঙ্গীয় অঞ্চলগুলিতে। মনে পড়ছে ১৯৫৬ সালে নির্মিত ফরাসী তথ্যচিত্র ‘নাইট এন্ড ফগ’-এর কথা, যা ফরাসী চলচ্চিত্রী আলাঁ রেনের (Alain Resnais) প্রথম ছবিও বটে। এই ছবিটির কথা মনে পড়ছে ভারতীয় ভারতীয় ফ্যাসিবাদ ও তাদের বর্ণবাদী-জাতিবাদী কার্যকলাপ দেখে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমরা চাক্ষুষ করছি।

আমরা দেখছি ভারতের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি ফ্যাসিবাদ বহুজাতিক, বহুদেশীয় ও বহুত্ববাদী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে তৎপর। এজন্য তাদের অন্যতম লক্ষ্য, ভারতের মধ্যে থাকা বৃহৎ বঙ্গের অঞ্চলগুলি। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লির শাসক চায় এই অঞ্চলগুলিকে দখল করে এইসব এলাকার বঙ্গীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করতে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরবঙ্গ, ঈশানবঙ্গ ও মানভূম তাদের বিশেষ নজরে। যার দরুণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি ঈশানবঙ্গ-সহ গোটা অসমের মোট ১৭ লাখ বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন করার লক্ষ্যে এনআরসি লাগু করে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ডিটেইনশন ক্যাম্পের মধ্যে আটক করে রাখা হয়েছে বহু বাংলাভাষীকে। এমনকি কোভিডের কারণেও তাদের উপর রাষ্ট্রের কোনোরকম ‘দয়া’ বর্ষিত হয়নি। কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার অনেক আগে থেকে শুরু করে অতিমারী ছড়িয়ে পড়ার সময়ে, লকডাউন চলাকালীন সময়ে এবং তার পরেও সেখানে মৃত্যু হয়েছে অনেকের। মৃত্যু জারি রয়েছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শিবির ও কেন্দ্রীয় সরকার বলছে তারা পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করতে বদ্ধপরিকর। এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেশনস), এনপিআর (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) ও সিএএ’র (সিটিজেনশীপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) মাধ্যমে সংঘ পরিবার নিয়ন্ত্রিত ভারতের ইউনিয়ন সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনের নামে অধিবাসীদের রাষ্ট্রহীন করে জল-জমি-জঙ্গল লুঠ করার পরিকল্পনাই স্পষ্ট হচ্ছে।

ত্রিপুরায় এখন অবধি এনআরসি লাগু না হলেও একটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে ভুল বুঝিয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হচ্ছে। ফলত সেখানেও বাঙলাভাষী ও বাঙালিদের প্রাণ যাচ্ছে অকাতরে। এহেন পরিস্থিতিতে, বিশেষত অসমের বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিমের উপর নেমে আসা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গও আশঙ্কায় রয়েছে। যদি না মোকাবিলা করা যায় এহেন হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী অপশক্তিকে তাহলে ডিটেইনশন ক্যাম্পই হতে পারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি বঙ্গীয় অঞ্চলের ভূমি-অধিবাসীদের আগামী ঠিকানা। এই পরিস্থিতিতে ‘নাইট এন্ড ফগের কথা’-এর কথা স্মরণে আসা স্বাভাবিক।

নাইট এন্ড ফগ

আমরা সকলেই জানি এই ছবিটার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানি অধিকৃত পোল্যান্ডের আউশুইৎস (Auschwitz) কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, মাজদানেক (Mazdanek) কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং এই সকল ক্যাম্পের ভিতরে ইহুদী, কমিউনিস্ট-সহ নাৎসি বিরোধী সাধারণ মানুষের ওপর 'পাশবিক' অত্যাচারের ব্যাপারেও সকলেই কমবেশি অবগত। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের আপাত অবসানের পর ১৯৫৬ সালে আলাঁ রেনে এই সকল পরিত্যক্ত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোকে তুলে আনলেন তাঁর তথ্যচিত্রে। ফাঁকা পড়ে থাকা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোকে কখনো ট্রলিতে, কখনো ক্রেনের ওঠা-নামার মাধ্যমে দৃশ্যায়িত করে পোয়েটিক ঢঙে ঢুকে পড়লেন বীভৎস স্মৃতির ভিতর।

শূন্য পড়ে থাকা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সামনে অবধি রেলের ট্র্যাক পাতা। বিচ্ছিন্ন ট্র্যাক। যে ট্র্যাক বা লাইন দিয়ে দরজা-জানলা বন্ধরাখা ট্রেন এসে থামতো ক্যাম্পগুলোর সামনে। ট্রেনের ভিতরে গবাদিপশুর মতো করে নিয়ে আসা হতো ইহুদী, কমিউনিস্ট-সহ নাৎসিদের চোখে 'জাতিশত্রু' হিসাবে চিহ্নিত মানুষেরা।

জন্নত ও জাহান্নামের ঠিকানা কোথায় আমরা জানি না। কিন্তু বর্ণবাদ-জাতিবাদমুক্ত, ধনবৈষম্যহীন, লিঙ্গবৈষম্যহীন সমানাধিকার নিশ্চিত হওয়া জনগণতান্ত্রিক যে সমাজ আমাদের কাছে ইহলৌকিকতার মধ্যে বেহেস্তের ধারণা তৈরি করেছিল, যে ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছিল 'ইমাজিন দেয়ার ইজ নো কান্ট্রি', যেখানে হেভেন কোনো মেটাফিজিক্যাল স্পেস নয় বরং মানুষই এ দুনিয়ায় স্বর্গ কায়েম করতে পারে... সেই ইহলৌকিক 'হেভেন'-এর বিপরীতে ইহলৌকিক জাহান্নামের হদিশও দিয়েছিল তারা, যারা 'জাতীয় সমাজবাদ'-এর স্লোগান দিয়ে বর্ণতত্ত্বের ভিত্তিতে শিল্পপতি আর মুদ্রারাক্ষদের ক্ষমতায়ণে অতি-জাতীয়তাবাদী 'জাতিরাষ্ট্র' কায়েম করেছিল, যা একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও বটে, সেই নাৎসি জাহেলিয়াতের যুগের ইহলৌকিকতায় কায়েম হওয়া জাহান্নামের দগদগে স্মৃতিকে উস্কে দিতে পেরেছিলেন আলা রেনে।

সিনেমাটোগ্রাফার ঘিসলেইন ক্লোকেট (Ghislain Cloquet) ও সাচা ভিয়ের্নির (Sacha Vierny) শূন্য পড়ে থাকা কনস্ট্রেশন ক্যাম্পকে যথাক্রমে বাইরে ও ভিতর থেকে সচল ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দীর মাধ্যমে স্পেসের দারুণ চারুকল্প রচনা করে গেছেন এই ছবিতে এবং যা সফল হয়েছিল অবশ্যই যোগ্য সম্পাদনার বদৌলতে। বলে রাখা ভালো, ছবিটির সম্পাদনা করেছিলেন আলা রেনে স্বয়ং। পরিত্যক্ত কনসেন্ট্রেশন

ক্যাম্পে ক্যামেরার ওঠা-নামা ও বয়ে চলায় স্থানচেতনার ভিতরে যে গতি সঞ্চারিত হয় এই ছবিতে, যার মাধ্যমে আলা রেনে অনায়াসে রক্তাক্ত ইতিহাসের কালচেতনায় তৈরি করেন আমাদের মনোজগতে । ফ্লাশব্যাকের আয়োজন সহজাত হয়। নাৎসিবাদী-জাহেলিয়াত টাইমকে নিরীহ-শূন্য-নিথর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের স্পেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন চলচ্চিত্রী। ব্যবচ্ছেদ ঘটে সময়ের। অডিও-ভিস্যুয়ালের টাইম-স্পেস কনশাসনেস তৈরি হয় অনায়াসে। সেই কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে মিশেল বোকের (Michel Bouquet) কণ্ঠে পোয়েটিক ও পলিটিক্যাল কমেন্ট্রি বা ভয়েস ওভারে। যা ছবিটতে নাৎসি জমানার স্মৃতিচারণের আখ্যানকে পূর্ণ করে তোলে।

৩২ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের এই তথ্যচিত্রটি স্মৃতির ব্যবচ্ছেদ করেছিল। আর আজকে এই ছবিটির নানান ইমেজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঈশানবঙ্গের বাংলাভাষীদের ঘটমান বাস্তবতা। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আগামীর আশঙ্কার অস্বস্তি হয়েও এই তথ্যচিত্রটি ধরা দেয় অনেকের কাছেই। যেহেতু এই তথ্যচিত্র ইতিহাসের হাড়হিম করা জাহান্নামের যেসব দলিল তুলে এনেছিল , তেমনভাবেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। হিটলারের মতো প্রসারিত হাতের ভঙ্গিমায় নরেন্দ্র মোদি 'মন কি বাতে'র বক্তৃতা রাখছেন আর গোয়েবলসীয় কায়দায় ভারতীয় মাসমিডিয়া পয়দা করছে 'সত্য', কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচারড হচ্ছে গ্লোবাল ফিনান্স ক্যাপিটালের দাসত্ব করা ভারতীয় পলিটির ফ্যাসিস্ট পরিকাঠামোর সম্প্রসারে।

ইহুদীর বদলে টার্গেট জোনে রাখা হয়েছে মুসলিমদের। নিও-ইকোনমিক অ্যাবস্ট্রাক্ট ইম্পিরিয়ালিজম বিশ্বায়ণের পাশাপাশি যে 'ওয়ার অন টেরর' প্রোজেক্ট চালু করেছিল বিশ্বব্যাপী তার পার্টনার হিসাবে একদিকে ইসলামোফোবিয়া অন্যদিকে বাংলাফোবিয়া পয়দা করে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি জাতিবাদীরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলছে ডিটেইনশন ক্যাম্প। যেখানে লাখো বাংলাভাষীকে আটক করে রাখা হয়েছে। এরপরেও আরো ডিটেইনশন ক্যাম্প বানানোর তোড়জোড় চলছে, চলছে নাগরিককে বন্দী করে তার জল-জমি-জঙ্গল-বাস্তুভিটা-গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করার খেলা। চলছে বর্ণবাদী-জাতিবাদী নির্যাতন, গণহত্যা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি 'নাইট এন্ড ফগ' তথ্যচিত্রটির ঐতিহাসিক ইমেজগুলির পুনরুত্থান।

ইতিহাস ও তার ডকুমেন্টেড ইমেজ (এই সিনেমার মধ্য থেকে):

কনসেন্ট্রেশনের ক্যাম্পের গারদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বন্দীরা। এবং তাঁরা নারী।

কাট টু

অসমে এখনাকার ইমেজ: ডিটেইনশন ক্যাম্পের গারদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বন্দীরা। এবং তাঁরা নারী।

নাইট অ্যান্ড ফগ ছবির ভিডিও সূত্রঃ https://youtu.be/wTBwpKB16gA

১৯৪৭-এ ভাগ হয়েছিল বাংলা। যার জেরে এপার থেকে বহু বাঙালি মুসলিমকে অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও যেতে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে গড়ে ওঠা বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তে আর ওই পূব দিক থেকে বহু বাঙালি হিন্দুর ঢল আছড়ে পড়েছিল বঙ্গদেশের ঈশানকোণে ত্রিপুর প্রদেশে এবং পশ্চিমপ্রান্তে। যে অঞ্চলগুলো সবকটিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। এই আসা-যাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস জারি থেকেছে একাত্তরের কিছুদিন পর অবধিও। একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। দিল্লি, গুজরাত, উত্তর ভারতের রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের নিম্নবর্গ বিদ্বেষ এবং হিন্দি-হিন্দুত্বের রাজনীতিই যে বাংলা ও পঞ্জাব বিভাজনের মূল কারণ তা নতুন করে বলতে হয় না। তাই নিজের মাটি ছেড়ে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের

ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিষয়টি গড় ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয় বরং তারা বাধ্যতই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রবাদ বলছে, সাতচল্লিশে তৈরি হওয়া ভারত রাষ্ট্রে শুরু থেকে যারা ছিলেন এবং যারা অন্যত্র চলে যাননি তাদেরকেই মূলত এখানকার নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর জন্য পূর্বপ্রজন্মের নাগরিক পরিচিতি, বাসস্থানের দলিল ইত্যাদি পেশ করতে হবে রাষ্ট্রের কাছে। কাগজের ভিত্তিতে ঠিক হবে কারা এই ভারতের নাগরিক! বলা বাহুল্য, পঞ্জাবের জনবন্টনের বিষয়টি সাতচল্লিশেই অনেকটা মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় এনআরসির প্রকোপ তাদের ওপর তেমন পড়বে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার মানুষেরাই এর টার্গেট হবে। হয়েছেও। যারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তাদের ফের বাস্তুচ্যুত হতে হবে অসমের বাঙালিদের মতোই, এমনকি যারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বঙ্গীয় অঞ্চলগুলোর বাসিন্দা ঐতিহাসিকভাবেই, তাদের পক্ষেও পূর্বপ্রজন্মের দলিলদস্তাবেজ জোগাড় করে রাষ্ট্রের কাছে জমা দেওয়ার বিষয়টি অতটা সহজ নয়। ফলে একটা বড় অংশের মানুষের কপালে রাষ্ট্রহীন হওয়ার আশঙ্কা যে এখনও ঝুলে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা ইতোমধ্যেই অসমের ক্ষেত্রে হয়েছে। সেই একই পরিণতি আশঙ্কা হয়ে খাড়ায়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আগামী ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও! মূর্ত হচ্ছে 'নাইট এন্ড ফগ-এর চিত্রমালা। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বদলে কেবল ডিটেইনশন ক্যাম্প, বাকি সব এক। উচ্ছেদ, গুমখুন ও গণহত্যার কোলাজ। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু ফ্যাসিবাদের হিন্দি-হিন্দুত্বের বিষ, বাংলাবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশের গণমগজে।

এই আশঙ্কার সামনে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সামনে অনেকের চেতনাতেই তাই গাঢ় হচ্ছে শৈত্যভাব। মনে হচ্ছে যেন কোথাও একটা কাজ করছে স্থবিরতা। আশঙ্কাঘেরা কুয়াশাচ্ছন্ন বিমর্ষ রাত ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে। তবুও আমাদের মতো কারও কারও মনে কোথাও একটা উঁকি মেরে যায় আশার ঝলকানি। ফ্যাসিবাদ কখনো চিরস্থায়ী নয়। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প/ ডিটেইনশন ক্যাম্প চিরস্থায়ী কোনো অবকাঠামো নয়। তার সমাপনও লেখা হয় ইতিহাসের পাতায়। শুধু মাঝে অকাতরে প্রাণ যায় অগুন্তি সাধারণ মানুষের। একেকটা জীবন উজাড় হয়ে যায়। যেমনটা হয়েছিল ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি জমানায়।

দ্বিতীয় পর্ব

রাষ্ট্রের ফাঁদ, মায়া ও অস্তিত্ব

বর্ডার, সার্বভৌমত্ব, আধুনিক রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ, চর্চা, পড়ালেখা ইত্যাদির ফাঁকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমার নজর কেড়েছিল কিম কি দুকের 'দি নেট' নামের একটি কাহিনীচিত্র। সেই ছবিটি নিয়ে আলাপ করব এবং সেই সূত্রে সার্বভৌমত্ব, সীমানা, সীমান্ত, নাগরিক, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আরও কিছু উপলব্ধির কথা আবারো এসে পড়বে। ভারতীয় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ফ্যাসিবাদী পর্যালোচনার সঙ্গেও যা সম্পর্কযুক্ত।

এই ছবিটির কাহিনী যেহেতু দুটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ঘিরে তাই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া দুটি আলাদা রাষ্ট্র হলেও রাষ্ট্রীয় পরিচিতি ও নাগরিক পরিচিতির সমান্তরালে উভয় রাষ্ট্রের জাতীয়তা প্রায় একই। উভয় রাষ্ট্রের গণমানুষ মূলত কোরিয়। পরে তারা উত্তর কিংবা দক্ষিন কোরিয় একেকটি রাষ্ট্রের নিরীখে। এটা অনেকটাই বাংলা বা পঞ্জাবের মানুষের মতোই।

যেমন 'ভারতীয়' শব্দটি তো আদতে নাগরিকত্ব প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রনৈতিক শব্দ। অথচ এটাকে জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত শব্দ প্রচার করা হয়। আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়, জাতীয়তা কখনো

রাষ্ট্রনৈতিক নয় বরং ভাষা ও জাতিসত্তাই জাতীয়তা বা জাতীয় পরিচিতির উপাদান। সেক্ষেত্রে বাঙালি একটি জাতীয়তা বা জাতীয় পরিচিতির নাম। যা একইসঙ্গে বাংলাদেশী ও ভারতীয় নাগরিক পরিচিতির মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশে বাঙালির সংখ্যা ৯০ শতাংশের বেশি হলেও ওই রাষ্ট্রকে ফেডারাল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়নি। সে অবশ্য অন্য আলাপ। কিন্তু এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন 'বাংলাদেশী' নামক রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক পরিচিতির অন্দরে বাঙালি, চাকমা, মার্মা এরজকম বেশ কিছু জাতীয়তা ও জাতীয় পরিচিতির বৈচিত্র্য ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে প্রায়-ফেডারাল কাঠামোর ভারতে বাঙালি-সহ বহুবিধ জাতীয়তা ও জাতীয় পরিচয় রয়েছে। যা 'ইন্ডিয়ান' বা 'ভারতীয়' নামক রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্ব পরিচিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সম্পর্কিত।

'দি নেট'-এর প্রসঙ্গে আসছি। তবে এই ছবিটিতে রাষ্ট্র ও তার সীমানা যেহেতু বড় একটা ব্যাপার তাই, আবারও সেই কথাটার পুনরুল্লেখ করা দরাকার যে আমি আগেই বলেছি আমি নিজেকে বৃহৎ বঙ্গের বাঙালি বলেই মনে করি। যদিও আমার আমার বাপ-পিতামহের জন্মও পশ্চিমবঙ্গে। প্রপিতামহ ছিলেন সাতক্ষীরার। যা আজকের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি জেলা। কবিতালেখা, সাহিত্যচর্চা আর আর্ট এন কালচার সূত্রে আমি ওপার বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ট। সাংবাদিকতার পেশা সূত্রেও বিগত বছর দুয়েকের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এখন মনে হয় শহরযাপনের রোম্যান্টিক স্মৃতির ক্ষেত্রে কলকাতার থেকে ঢাকা আমার অনেক কাছের, অনেক প্রাণের জায়গা।

সে যাইহোক, কাজের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়ত করতে গিয়ে দেখেছি রাষ্ট্রীয় সীমানা, সীমান্ত, অভিভাষণ, শুল্ক দফতর-সহ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রীয় ও স্বরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোগুলোর কথা বাদ দিলে আমি কখনোই বাংলাদেশকে 'অন্য দেশ' বলে ভাবতে পারিনি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ তো একটাই দেশ। কারণ দেশের ধারণার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাষা ও সংস্কৃতি। আর রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌমত্ব ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনি ধারণা। রাষ্ট্র আর দেশ কখনোই এক নয়।

'দি নেট' প্রসঙ্গে আসি। বর্ডার, সার্বভৌমত্ব, আধুনিক রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের যাপিত জীবনে, চারুশিল্পে, কথা ও কাব্যে, সিনে-বাস্তবতার রাজনৈতিক উপাদান হিসাবে নতুন করে হাজির হতে থাকবে বলেই মনে হয়। কেননা যাপিত জীবনের রাজনৈতিকতার সঙ্গে এই সকল বিষয়গুলো যখন জড়িয়ে গেছে ক্রমশই তখন দেখি সুদূর দক্ষিণ কোরিয়ায় বসে কিম কি দুক বানিয়ে তুলেছেন রাষ্ট্রীয় ফাঁদের সিনে-কথন। ২০১৬ সালে এই ছবি নির্মাণ করেছিলেন কিম।

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, পররাষ্ট্রীয় নীতি এসবের কাছে সাধারণ নাগরিকের অস্তিত্ব ও যাপন অতিনগন্য বিষয়। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র একসময় সাধারণ নিরীহ নাগরিককেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবতে শুরু করে। কিম কি দুকের 'দি নেট' রাষ্ট্রবাদের এই মুখচ্ছবি প্রকাশ করেছে। যেখানে সীমান্ত, সশস্ত্র বাহিনী, অর্ডার এবং কর্তৃত্বের প্রতি নিজের ব্যক্তিসত্তার সমর্পণই নাগরিকের দায়িত্ব। জনকল্যাণ ও নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ও আকাঙ্খাপূরণে আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের যে কর্তব্য তার চেয়ে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের লয়ালিটি কতটা, সেটাই রাষ্ট্রনৈতিকতায় বিবেচ্য হয়ে ওঠে। 'দি নেট' এমন সব চিন্তার মধ্যে দর্শককে নিয়ে যায়। কোরিয়ান চলচ্চিত্রী কিম কি দুকের অন্যান্য ছবিগুলোর তুলনায় এই ছবিটি কিছুটা আলাদা। তার ছবি সচারাচর যেসব বিষয় বা মুড নিয়ে কাজ করে এই ছবির কাহিনী, আবহ তা থেকে ভিন্ন। কিম কি দুক নাগরিক তথা মানবসত্তার প্রতি রাষ্ট্রীয়সত্তার বৈরীতামুলক আচরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ছবিকে করে তুলেছেন রাজনৈতিক।

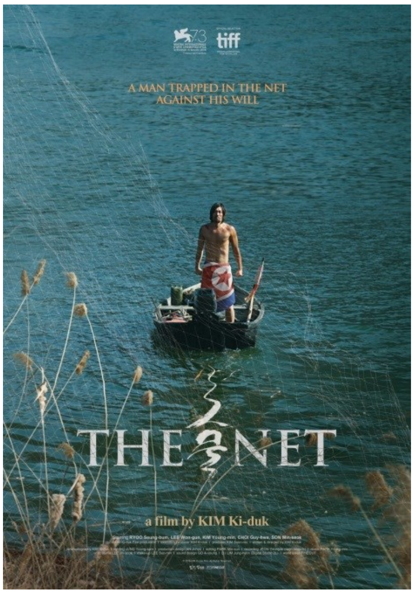

‘দি নেট’ ছবির পোস্টার

এই ছবির গল্প খানিকটা এমন। উত্তর কোরিয়ার গরীব মৎস্যজীবী নম চল-উ তার স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে নিয়ে নিজের দেশে সুখেশান্তিতেই বসবাস করে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝের জলবিভাজিকায় মাছ ধরে দিন কাটে তার কিন্তু একদিন মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে তার নৌকার ইঞ্জিনের মাছ ধরার জাল আটকে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ইঞ্জিন। উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগেই নদীর স্রোতে নৌকা ভেসে যায় দক্ষিণ কোরিয়ায় সীমানায়। কোনোভাবেই নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বেচারা মৎস্যজীবী নম চল-উ। সাউথ কোরিয়ায় গিয়ে নৌকা থামে। তাকে গুপ্তচর সন্দেহে আটক করে সাউথ কোরিয়ার সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এরপর এই মৎস্যজীবীকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। এক সময় টর্চার সেলে নিয়ে গিয়ে তাকে জানতে চাওয়া হয় কী তার পরিচয়! কিন্তু শেষমেশ এটা পরিস্কার হয় যে নেহাতই সে একজন সাধারণ নিরীহ মৎস্যজীবী। গুপ্তচর নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশাসন ওই ব্যক্তিকে তাদের দেশে থেকে যেতে বলে, যাতে তাকে দিয়ে বর্হিজগতে প্রচার করা যায় উত্তর কোরিয়ায় কোনো গণতন্ত্র নেই। কিন্তু ওই ব্যক্তি দেশপ্রেমিক। এছাড়া ওখানেই তার ঘর-সংসার। সে তাই দেশে ফিরে যেতে চায়। উত্তর কোরিয়াও তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য নানাভাবে আবেদন করে যেতে থাকে। এক সময় ছেড়ে দেওয়া হয় ওই ব্যক্তিকে। সে তার নৌকা নিয়েই জলপথ দিয়েই নিজের দেশে ফেরত আসে। তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। কিন্তু এই অভ্যর্থনা নেহাত লোক দেখানো। বরং নিজরাষ্ট্রের সরকারের সন্দেহ, এই মৎস্যজীবী বোধহয় ইচ্ছাকৃতই দক্ষিণ কোরিয়ায় গেছিল, সে হয়তো দক্ষিণ কোরিয়ায় চর! ফের নানাভাবে অত্যাচারের শিকার হয় নম চল-উ। শেষমেশ তাকে বলা হয়, আর কোনোদিন সে নদীতে মাছ ধরতে পারবে না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা ওই মৎস্যজীবী মেনে নিতে পারে না। নৌকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিষেধ অমান্য করেই। অতঃপর সীমান্ত বাহিনী তাকে গুলি করে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝের জলপথের নৌকায় ভেসে চলে তার লাশ। রাষ্ট্রনৈতিকতায় খুন হয় একজন নিরপরাধ সাধারণ নাগরিককে যে কিনা পেশায় মৎস্যজীবী।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নিজরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ায় প্রত্যাবর্তন মৎস্যজীবীর

এই ছবির নির্মাণ আঙ্গিক অতিসাধারণ। মিনিম্যালিস্ট প্রোডাকশন ডিজাইন। চিত্রনাট্যের ড্রামা অত্যন্ত পরিণত এবং প্রয়োজনীয়। কিম কি দুক সামগ্রীকভাবে এই ছবিটি পরিচালনার পাশাপাশি নিজেই সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগটির দেখভাল করেছেন। ক্লোজআপ, মিড-ক্লোজআপ ও মিড-শটের বুননে ক্যামেরার সাবলীল গতিবিধি ও তার সঙ্গে কাট-টু-কাটের ছন্দ বজায় রেখে সম্পাদনা। যা একেবারেই মেদহীন। ছবিটির টানটান চিত্রনাট্যের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখা সিনেমাটোগ্রাফি ও সম্পাদনায় ছবিটি একটি আখ্যানধর্মী কবিতার জন্ম দিয়েছে বলা যায়। সিনেমাটোগ্রাফি, এডিটিং ও মিউজিক এই ছবিকে কাব্যিক করে তুলেছে। এই ছবির ডিরেক্টর অব ফটোগ্রাফি বা ডিওপি স্বয়ং কিম কি দুক নিজেই। সম্পাদনা করেছেন পার্ক মিন-সান। অভিনয়ে রিও সেয়াং-বাম, লি ওন-গান, কিম ইয়ং-মিন, চই গাই-বাওয়া প্রমুখ। প্রত্যেকের অভিনয়ই নিঁখুত। বিশেষত মৎস্যজীবী চরিত্রে রিও সেয়াং-বামের অভিনয়। বলা যায়, অভিনয় এ ছবির প্রাণ। যা নিখুঁত। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নিজের রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ায় প্রতাবর্তনের সময় মৎস্যজীবীটি আবেগ ও অশ্রুর উদ্রেক ঘটায়। আর ছবির একেবারে শেষে যখন মৎস্যজীবীর লাশ ভেসে থাকে নদীতে। এক্সট্রীম লঙশটে দেখা যায় একটি উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং আরেকটি তথাকথিত সমাজবাদী সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাঝের জলবিভাজিকায় লাশ হয়ে ভাসছে কোরিয়ান মৎস্যজীবী! তিনি আসলে কোরিয়ান জাতীয়তার আইকন! এই দৃশ্য দেখে বৃহৎ বঙ্গদেশের মাঝে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানাকে ঘিরে বঙ্গীয় ভূমিজাতীয়তার খণ্ডবিখণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার কথা ফের মাথার মধ্যে উঁকি দেয়। ঋত্বিক ঘটক ‘কোমলগান্ধার’-এ যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যাওয়ার রেললাইন দিয়ে বৃহৎ বঙ্গের মাঝের যোগচিহ্নের বিয়োগান্তর পরিণতিকে চিহ্নিত করেছিলেন, তা আজকের বাস্তবতায় আবারও মূর্ত হয় কিম কি দুকের সৌজন্যে।

এনআরসি ইত্যাদি সম্পূর্ণ কায়েম হলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাভাষী মানুষের অবস্থা হবে ওই কোরিয়ান মৎস্যজীবীর থেকেও খারাপ। তাদের দেশ, জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষিক পরিচিতি ইত্যাদি সব থাকার পরেও নির্দিষ্ট দলিল-দস্তাবেজের কারণে ফ্যাসিস্ট ভারত নাগরিক বলে স্বীকার করবে না। বাংলাদেশও নিশ্চই এত মানুষের বাড়তি দায়িত্ব নেবে না। তার ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রঙ্গ দেখে বুঝতে পারি তারা আসলেই দিল্লির অনুগত! বঙ্গ, বাঙালি ইত্যাদির থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বৈশ্বিক কূটনৈতিক সমীকরণ অনুযায়ী দিল্লির রাষ্ট্রনৈতিক মৈত্রী। তাদের কাছে বাংলা ও বাংলাভাষীর স্বার্থের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিল্লির সঙ্গে দোস্তির বিষয়টা। তারা দিল্লির বাংলাবিদ্বেষ, বাংলাদেশবিদ্বেষ ও ইসলামবিদ্বেষের

বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করে। আর তাই তো বাংলাদেশের নিরাপরাধ নাগরিক ফেলানি খাতুনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে সীমান্তের কাঁটতারে ঝুলিয়ে রাখলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তা নিয়ে কোনো হেলদোল হয় না। প্রতি মুহূর্তে সীমান্তসন্ত্রাস বাড়িয়ে তোলে মূলত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এমনকি কোভিডের লকডাউন চলাকালীন অবস্থায় ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে 'মানসিক ভারসাম্যহীন' এক ভারতীয় নাগরিক বাঙালিকে বাংলাদেশে চালান করার চেষ্টা চালিয়েছে বিএসএফ, তাদের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে

(সূত্র:
https://sarabangla.net/post/sb422795/?fbclid=IwAR1XjNcfPEmKMBLPtxzYV4XFJ2SHLRec13y55ldLWpLYK4NzQyKyEsaAjAs)। আর তাই এনআরসি কায়েম হলে নিরপরাধ ভারতীয় বাঙালি ও বাঙলাভাষীদের বড় অংশ রাষ্ট্রহীন হয়ে ভাবগতভাবে দুই রাষ্ট্রের সীমান্তের মাঝের নো-ম্যানস ল্যান্ডে তাদের ভবিষ্যতকে তারা সমর্পণ করবে এবং কার্যত ডিটেইনশ ক্যাম্পের বাইরে ও ভেতরে কাউকে গবাদি পশুর মতো বাঁচতে হবে, কাউকে গুজরাতি-বানিয়া পুঁজি ও বৈশ্বিক লগ্নিপুঁজির দাস হয়ে নিজভূমে পরবাসীর মতো বাঁচতে হবে। অস্তিত্ব নিকেষ করবে রাষ্ট্র। কেউ কেউ ফেলানী খাতুনের মতো সীমান্তে ঝুলে থাকবেন লাশ হয়ে, কোরিয়ান মৎস্যজীবী চরিত্রটির মতো কাউকে কাউকে ভাসতে হবে ইছামতী কিংবা তিস্তার পানিতে! পদ্মার চরে পড়ে থাকবে কারও কারো লাশ! হয়তো এসব কিছুই হবে না, প্রতিহত হবে ফ্যাসিবাদ, সেই আশাতেই বুক বাঁধি আমরা। কিন্তু আশঙ্কার ভিতর দিয়ে আমাদের দিনযাপন করতে হয়। কিন্তু এই আশঙ্কা নিয়ে দিনযাপন কি মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেয় না আমাদের? আমরা কি পারি না ঋজু শিড়দাঁড়া নিয়ে এই বিদ্যমান ফ্যাসিস্ট পরিকাঠামোর সম্মুখে আমাদের দ্রোহের মন্তাজ নির্মাণ করতে? প্রশ্নগুলো থাকুক। শিল্পের ভিতরে। গদ্যের ভিতরে। চিত্রকল্পে। আমাদের মায়ারচেতনে। আমাদের ভাষাপ্রেমে। আমাদের যাপিতজীবনের অন্দরে। প্রশ্নগুলো আমাদের আয়নার সামনে দাঁড় করাক।

কিম কি দুক-এর ছবি 'দ্য নেট'য়ের ভিডিও সূত্র (https://youtu.be/a-w-g07bT3E)

অতনু সিংহ (জন্ম ১৯৮২) মূলত কবি। পড়াশুনা গণজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রবিদ্যা। সবই পশ্চিমবঙ্গে। সমাজ-রাজনীতি, চলচ্চিত্র, লোকসংস্কৃতি ও বাংলার ভাবান্দোলন বিষয়ে গদ্য লেখেন। ছোটগল্পও লিখেছেন বেশ কয়েকটি। এখন অবধি মোট ৪টি কাব্যগ্রন্থ ও ১টি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু সময় পশ্চিমবঙ্গের কবিতা পত্রিকা 'লালন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বৃহৎ বঙ্গের অনলাইন সাহিত্য পোর্টাল 'প্রতিপক্ষ'র কার্যনির্বাহী সম্পাদক। 'প্রিয় মরফিন' নামে একটি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সাংবাদিকতার পেশা ও লেখালেখি সূত্রে বেশ কিছু সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে থেকেছেন। নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি না বলে বড় বাংলার বাঙালি হিসাবে পরিচয় দেন।

Copyright © 2020   Atanu Singha, Published 31st Dec, 2020.
আলোকচিত্র সূত্রঃ YouTube